চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-11

ছোটদের নাবী-রসূলদের জীবনী

[তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক]

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা) জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
ভাষা সহযোগিতায়	প্রমি, রজিত, তন্নী
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

রেফারেন্স ঃ নবীদের কাহিনী - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নাবীদের জীবনী

সূচীপত্র

আদম (আলাইহিস সালাম)	৪
নূহ (আলাইহিস সালাম)	৭
ইদরীস (আলাইহিস সালাম)	১০
হূদ (আলাইহিস সালাম)	১১
সালেহ (আলাইহিস সালাম)	১৩
ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)	১৫
লূত (আলাইহিস সালাম)	১৭
ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)	১৯
ইসহাক (আলাইহিস সালাম)	১৯
ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)	২০
ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)	২১
আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)	২৪
শো'আয়েব (আলাইহিস সালাম)	২৫
মূসা ও হারূণ (আলাইহিস সালাম)	২৭
ইউনুস (আলাইহিস সালাম)	২৯
দাউদ (আলাইহিস সালাম)	৩১
সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)	৩২
ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম)	৩৪
আল-ইয়াসা' (আলাইহিস সালাম)	৩৬
যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম)	৩৬
ঈসা (আলাইহিস সালাম)	৩৮

বিশেষ নোট ঃ

এই বইয়ে নাবী ও রসূলদের নামের সাথে সংক্ষপে (আ.) ব্যবহার করা হয়েছে যার পূর্ণ রূপে হচ্ছে "আলাইহিস সালাম" অর্থ "তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক" ।

আদম (আলাইহিস সালাম)

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ঃ প্রথম মানুষ ও প্রথম নাবী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে নিজের দু'হাত দিয়ে সরাসরি সৃষ্টি করেন (সোয়াদ ঃ ৭৫)। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম কাঠামোতে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ ১২; সূরা সাফফাত ৩৭ ঃ ১১; সূরা আর রহমান ৫৫ ঃ ১৪; সূরা তীন ৯৫ ঃ ৪)

হাওয়াকে সৃষ্টি ঃ অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। (সূরা নিসা ৪ ঃ ১; মুত্তাফাক্ব আলাইহি)। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসেবেই যাত্রা আরম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে।

ইবলিসের পরিচয় ঃ প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আ.)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহ্র খিলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত (সূরা লুকমান ঃ ২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব (সূরা ইসরা ঃ ৭০)। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় (সূরা বাক্বারাহ ঃ ৩৪)। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতকারী। সে কারণে জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল। ইবলীসকে আল্লাহ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য ও তাকে ধোঁকা দেয়াই শয়তানের একমাত্র কাজ।

জান্নাতে বসবাস এবং ইবলিশের ষড়যন্ত্র ঃ তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বললেন, 'তোমরা দু'জন জান্নাতে বসবাস কর ও সেখান থেকে যা খুশী খেয়ে বেড়াও। তবে সাবধান! এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তা হলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (সূরা বাক্বারাহ ঃ ৩৫)। অতঃপর বহিষ্কৃত ইবলীস তার প্রথম টার্গেট হিসেবে আদম ও হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার জাল নিক্ষেপ করল। সেমতে সে প্রথমে তাদের খুব আপনজন বনে গেল এবং নানা কথায় তাদের ভুলাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে বলল, 'আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হল এই যে, তোমরা তা হলে ফিরিশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে' (সূরা আ'রাফ ঃ ২০)। সে অতঃপর কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল কামনা করি' (সূরা আ'রাফ ঃ ২১)। 'এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তারা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেল। ফলে সাথে সাথে তাদের কাপড় খুলে পরে গেল এবং তারা তাড়াতাড়ি গাছের পাতা সমূহ দিয়ে তাদের শরীর ঢাকতে লাগল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা আ'রাফ ঃ ২২, সূরা নিসা ঃ ১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ)

পৃথিবীতে প্রেরণ ঃ তখন তারা অনুতপ্ত হ'য়ে বলল, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' (সূরা আ'রাফ ঃ ২৩)। 'আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের অবস্থান হবে পৃথিবীতে এবং সেখানেই তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সম্পদরাজি ভোগ করবে' (সূরা আ'রাফ ঃ ২৪)। তিনি আরও বললেন যে, 'তোমরা পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরায় উঠবে' (সূরা আ'রাফ ঃ ২০-২৫)।

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় আদম (আ.) ঃ সর্বপ্রথম আদম (আ.)-এর উপরে যে সব অহী নাযিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত। যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ী সর্বপ্রথম আদম (আ.) আবিষ্কার করেন। যা তিনি অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আদমের যুগে পৃথিবীর প্রথম কৃষিপণ্য ছিল 'তীন' ফল।

আদম পুত্রদ্বয়ের কাহিনী ঃ হাবীল এবং কাবীল আদম (আ.)-এর দুই ছেলে। দু' ভাই আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু আল্লাহ হাবীলের কুরবানী কবুল করেন এবং কাবীলেরটা করেননি। তাতে ক্ষেপে গিয়ে কাবীল হাবীলকে হত্যা করে। উলেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত আগুন গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ'ত। ক্বাবীল কৃষিকাজ করত। সে কার্পণ্য বশে কিছু নিকৃষ্ট প্রকারের শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। হাবীল পশু পালন করত। সে আল্লাহ্র ভালবাসায় তার উৎকৃষ্ট দুম্বাটি কুরবানী করল। অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি নিয়ে গেল। কিন্তু কাবীলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। 'অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। যে মাটি খনন করতে লাগল এটা দেখানোর জন্য যে কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করবে। সে বলল, হায়! আমি কি এই কাকটির মতোও হ'তে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হল' (সূরা মায়িদা ঃ ২৭-৩১)।

মৃত্যু ও বয়স ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হল জুম'আর দিন। এ দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে...'। (মুয়াত্তা, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

আদম (আ.)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. তিনি সরাসরি আল্লাহ্‌র দু'হাতে গড়া এবং মাটি হ'তে সৃষ্ট। তিনি জ্ঞানসম্পন্ন ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে জীবন লাভ করেছিলেন।
২. তিনি ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নাবী। (মুয়াত্ত্ব, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)
৩. তিনি জিন জাতির পরবর্তী প্রতিনিধি হিসেবে এবং দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্বশীল খলিফা হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।
৪. দুনিয়ার সকল সৃষ্ট বস্তুর নাম অর্থাৎ সেসবের জ্ঞান ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দান করা হয়েছিল।
৫. জিন ও ফিরিশতা সহ সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৃষ্টির উপরে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। সকলে তাদের অনগুত ও তাদের সেবায় নিয়োজিত।
৬. আদমকে জান্নাতে সৃষ্টি করা হয়। যা পৃথিবীর বাইরে আসমানে সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল, এখনও আছে।
৭. জান্নাতে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তার জোড়া হিসেবে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। সেকারণ স্ত্রী জাতি সর্বদা পুরুষ জাতির অনগুামী এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট।
৮. আদম ও হাওয়াকে আসমানী জান্নাত থেকে দুনিয়ায় মক্কার সন্নিকটে না'মান উপত্যকায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে।

৯. মানুষ হ'ল পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী। তাকে ভাল ও মন্দ দু'টিই করার ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।
১০. আদমের মধ্যে মানবত্ব ও নবুওয়াতের নিষ্পাপত্ব উভয় গুণ ছিল। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে অনুতপ্ত হন ও তাওবা করেন। তাওবা কবুল হবার পরে তিনি নবুওত প্রাপ্ত হন। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। একইভাবে আদমের বংশধরগণ পাপ করে তাওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে থাকেন।
১১. আদমকে সিজদা না করার পিছনে ইবলীসের অহংকার ও তার পরিণতিতে তার অভিশপ্ত হওয়ার ঘটনার মধ্যে মানুষকে অহংকারী না হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
১২. জৈবিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয়ে মানুষ একটি অসাধারণ সত্তা, যা অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়।
১৩. ঈমানদার বান্দাগণ ক্বিয়ামতের দিন বিচার শেষে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে।
১৪. দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার সকল জ্ঞান আদমকে দেয়া হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম ভূমি আবাদ ও চাকা চালিত পরিবহনের সূচনা হয়।
১৫. সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্‌র দাসত্বের জন্য।

নূহ (আলাইহিস সালাম)

নূহ (আ.)-এর পরিচয় ঃ নূহ (আ.) ছিলেন পিতা আদম (আ.)-এর দশম অথবা অষ্টম পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে ১ম রসূল। (সহীহ মুসলিম) নূহ (আ.)-এর চারটি পুত্র ছিল ঃ সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন'আন। (সূরা আনকাবুত ঃ ১৪ আয়াতের ব্যাখা) প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফির হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়। নূহ (আ.)-এর দাওয়াতে তাঁর কওমের হাতেগণা মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে মুক্তি পান। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন। (সূরা আনকাবুত ঃ ১৪-১৫)। ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নাবী হিসেবে শিরকে নিমজ্জিত জাতিকে দাওয়াত দেন। নূহ (আ.) ৯৫০ বছর জীবন পেয়েছিলেন (সূরা আনকাবুত ঃ ১৮)।

নূহ (আ.)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি ও তার জবাব ঃ ঐ জাতির অবিশ্বাসী নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নূহ (আ.)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। যথা ঃ

(১) আপনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নাবী হলে তো ফিরিশতা হতেন।
(২) আপনার অনুসারী হল আমাদের মধ্যকার হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা।
(৩) কওমের উপরে আপনাদের কোন প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় না (সূরা হূদ ঃ ২৭)।
(৪) আপনার দাওয়াত আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি বিরোধী।
(৫) আপনি আসলে নেতৃত্বের অভিলাষী (সূরা মু'মিনূন ঃ ২৪-২৫)। অতএব আপনাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি (সূরা হূদ ঃ ২৭)।

নূহ (আ.)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি ঃ আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.)-কে সাড়ে নয়শত বছরের সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। তিনি এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এই আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। এই সুদীর্ঘ দাওয়াতী জীবনীতে তিনি যেমন কখনো চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি, তেমনি কখনো নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ধৈর্য (সবর) ধরেন। জাতির নেতারা বলল, 'হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে পাথর মেরে তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেয়া হবে' (সূরা শু'আরা ঃ ১১৬)। তবুও বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দু'আ করে বলতে থাকেন, 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না' (তাফসীর কুরতুবী, সূরা নূহ)। এক সময় নিরাশ হয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন, আমাকে সাহায্য কর। কেননা ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে' (সূরা মু'মিনূন ঃ ২৬)। 'অতএব তুমি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথী মু'মিনদেরকে তুমি

(ওদের হাত থেকে) মুক্ত কর' (সূরা শু'আরা ঃ ১১৮)। নূহ (আ.)-এর এই দু'আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেন। যার ফলে তারা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হল এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মু'মিন নরনারী মুক্তি পেলেন।

নূহের প্লাবন ও আযাবের বিবরণ ঃ চূড়ান্ত আযাব আসার পূর্বে আল্লাহ নূহ (আ.)-কে বললেন, 'তুমি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশনা মোতাবেক একটা নৌকা তৈরী কর (সূরা হূদ ঃ ৩৭)।

আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর নূহ নৌকা তৈরী শুরু করল। তার জাতির নেতারা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে বিদ্রুপ করত। নূহ তাদের বলল, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে জেনে রেখো তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তেমনি তোমাদের উপহাস করছি' (সূরা হূদ ঃ ৩৮)। 'অচিরেই তোমরা জানতে পারবে লাঞ্ছনাকর আযাব কাদের উপরে আসে এবং কাদের উপরে নেমে আসে চিরস্থায়ী আযাব' (সূরা হূদ ঃ ৩৯)। আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং চুলা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, (অর্থাৎ রান্নার চুলা হ'তে পানি উথলে উঠলো), তখন আমি বললাম, সবপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বেই হুকুম নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের বাদ দিয়ে তোমার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নাও। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল' (সূরা হূদ ঃ ৪০)। 'নূহ তাঁদের বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (সূরা হূদ ঃ ৪১)।

'অতঃপর নৌকাখানি তাদের বহন করে নিয়ে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝ দিয়ে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে (ইয়ামকে) ডাক দিল- যখন সে দূরে ছিল, আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ কর, কাফিরদের সাথে থেকো না' (সূরা হূদ ঃ ৪২)। 'সে বলল, অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। যা আমাকে পানি হ'তে রক্ষা করবে'। নূহ বলল, 'আজকের দিনে আল্লাহ্র হুকুম থেকে কারু রক্ষা নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত। এমন সময় পিতা-পুত্র উভয়ের মাঝে বড় একটা ঢেউ এসে আড়াল করল এবং সে ডুবে গেল' (সূরা হূদ ঃ ৪৩)। জানা যায় যে নূহ-এর স্ত্রীও ঈমান আনেনি এবং ঐ প্লাবনে মারা গেছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল (অর্থাৎ হে প্লাবনের পানি! নেমে যাও)। হে আকাশ! ক্ষান্ত হও (অর্থাৎ তোমার বিরামহীন বৃষ্টি বন্ধ কর)। অতঃপর পানি হ্রাস পেল ও আযাব শেষ হল। ওদিকে জূদী পাহাড়ে গিয়ে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, অন্যায়কারীরা আল্লাহর রহমত হতে দূরে' (সূরা হূদ ঃ ৪৪)। 'এ সময় নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর তুমিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়সালাকারী (সূরা হূদ ঃ ৪৫)। 'আল্লাহ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্মপরায়ণ। তুমি আমার নিকটে এমন বিষয়ে আবেদন কর না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (সূরা হূদ ঃ ৪৬)। 'সে (নূহ আ.) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার অজানা বিষয়ে আবেদন করা হ'তে আমি তোমার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও দয়া না কর, তা হলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' (সূরা হূদ ঃ ৪৭)।

নূহ (আ.)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. নাবী পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না থাকার কারণে নূহের স্ত্রী ও পুত্র যেমন নাজাত লাভে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি এ যুগেও হওয়া সম্ভব। কাফির ও মুশরিক সন্তান বা কোন নিকটাত্মীয়ের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দু'আ করা জায়িয নয়।

২. ঈমানী সম্পদই বড় সম্পদ। আল্লাহ্র নিকটে ঈমানদারের মর্যাদা সর্বপেক্ষা বেশী। যদিও সে দুনিয়াবী জীবনে দীনহীন গরীব হয়।

৩. ঈমানহীন সমাজ নেতা ও ধনী লোকদের খুশী করার জন্য ঈমানদার গরীবদের দূরে সরিয়ে দেয়া যাবে না।

৪. মৃত নেককার মানুষের অসীলায় পরকালে মুক্তি পাওয়ার ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্ট মূর্তিপূজার শিরক বিশ্ব ইতিহাসের প্রাচীনতম শিরক। এই শিরকের কারণেই নূহের কওম আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংস হয়েছিল। তাই যাবতীয় প্রকারের শিরক থেকে তাওবা করা কর্তব্য।

৫. বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করার সাথে সাথে সাধ্যমত বাস্তব প্রচেষ্টা চালাতে হয়। যেমন নূহ (আ.) প্রথমে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। অতঃপর আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র হুকুমে নৌকা তৈরী করেন।

৬. আল্লাহ স্বীয় অহী দ্বারা বিভিন্ন নাবীর মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন শিল্পকর্মের সূচনা করেছেন, যেমন আদম (আ.)-এর মাধ্যমে কৃষিকর্ম ও চাকার প্রচলন করেছেন এবং নূহ (আ.)-এর মাধ্যমে জাহায শিল্পের সূচনা করেছেন।

৭. কিসে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত রয়েছে, মানুষ নিজে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাকে সর্বদা আল্লাহ্র রহমতের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাই 'আল্লাহ্র অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত এবং চূড়ান্ত সত্যের মাপকাঠি।

৮. পূর্বতন সকল নাবীর দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি দাওয়াত। মানুষের সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই হ'ল প্রকৃত অর্থে ইক্বামতে দ্বীন।

৯. আল্লাহ স্বীয় নেককার বান্দাগণের পক্ষে তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন এবং নেক বান্দাদের মুক্ত করেন। যেমন নূহের শত্রুদের থেকে আল্লাহ বদলা নিয়েছিলেন এবং নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের মুক্ত করেছিলেন।

১০. নাবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারী সমাজ সংস্কারকগণ সমাজের গালমন্দ খেয়েও সমাজ ত্যাগ করেন না। কিন্তু তাঁরা বদ দু'আ করলে আল্লাহর আযাব নেমে আসে।

ইদরীস (আলাইহিস সালাম)

ইদরীস (আ.)-এর পরিচয় ঃ তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নাবী। তাঁর নামে বহু উপকথা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। ইদরীস (আ.) নূহ (আ.)-এর পূর্বের নাবী ছিলেন, না পরের নাবী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি নূহ (আ.)-এর পরের নাবী ছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'তুমি এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নাবী'। 'আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম' (সূরা মারিয়াম ঃ ৫৬-৫৭)।

অন্যান্য নাবীদের সাথে সম্পর্ক ঃ সূরা মারিয়ামে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব ইয়াকূব, হারূণ, মূসা, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইবনে মারিয়াম ও ইদরীস (আ.)-এর আলোচনা শেষে আল্লাহ বলেন, এঁরাই হলেন সেই সকল নাবী, যাদেরকে নাবীগণের মধ্য হ'তে আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। এঁরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা (ইসলামের) সুপথ প্রদর্শন করেছি ও (ঈমানের জন্য) মনোনীত করেছি তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করা হ'ত, তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত' (সূরা মারিয়াম ঃ ৫৮)।

অত্র আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইদরীস (আ.) নূহ (আ.)-এর পরের নাবী ছিলেন। তবে নূহ ও ইদরীস আদম (আ.)-এর নিকটবর্তী নাবী ছিলেন, যেমন ইবরাহীম (আ.) নূহ (আ.)-এর নিকটবর্তী এবং ইসমাঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব ইবরাহীম (আ.)-এর নিকটবর্তী নাবী ছিলেন। (কুরতুবী সূরা মারিয়াম ৫৮-এর ব্যাখ্যা ৫৯)। নূহ পরবর্তী সকল মানুষ হলেন নূহের বংশধর। (কুরতুবী সূরা আ'রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা)।

ইদরীস (আ.)-এর জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ ইদরীস (আ.) হলেন প্রথম মানব, যাঁকে মু'জেযা হিসেবে জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি আল্লাহ্র ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাক হিসেবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে ক্বাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। (কুরতুবী, সূরা মারিয়াম ঃ ৫৬)

হূদ (আলাইহিস সালাম)

হূদ (আ.)-এর পরিচয় ঃ হূদ (আ.) দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী 'আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে নূহ-এর পরে 'আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। হূদ (আ.) ছিলেন এদেরই বংশধর। 'আদ ও সামূদ ছিল নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের বংশধর। 'আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার বা গোত্র ছিল। তাদের ক্ষেতখামারগুলো ছিল অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল।

হূদ (আ.)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি ঃ হূদ (আ.) নিজ জাতি 'আদকে শিরক পরিত্যাগ করে সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করার এবং যুলুম ও অত্যাচার পরিহার করে ন্যায় ও সুবিচারের পথে চলার আহ্বান জানান। কিন্তু নিজেদের ধন-ঐশ্বর্যের মোহে এবং দুনিয়ার শক্তির অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে তারা নাবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

'আদ জাতির উপরে আযাব-এর বিবরণ ঃ প্রাথমিক আযাব হিসেবে অবিরাম তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেতসমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগ-বাগিচা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তখন আসমানে সাদা, কালো ও লাল মেঘ দেখা দেয় এবং গায়েবী আওয়ায আসে যে, তোমরা কোনটি পছন্দ করো? লোকেরা কালো মেঘ কামনা করল। তখন কালো মেঘ এলো। লোকেরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'এটি আমাদের বৃষ্টি দেবে'। জবাবে তাদের নাবী হূদ (আ.) বললেন, 'বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু যার মধ্যে রয়েছে কঠিন আযাব'। 'সে তার প্রভুর আদেশে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে...'। (সূরা আহকাফ ঃ ২৪, ২৫) ফলে অবশেষে পরদিন ভোরে আল্লাহ্র চূড়ান্ত আযাব নেমে আসে। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে বাড়ী-ঘর সব ধ্বংসে যায়, প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে গাছ-পালা সব উপড়ে যায়, মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে পতিত হয় (সূরা ক্বমার ঃ ২০; সূরা হাক্বক্বাহ ঃ ৬-৮) এবং এভাবেই শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী 'আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, এছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অভিশাপ দুনিয়া ও আখিরাতে (সূরা হূদ ঃ ৬০)।

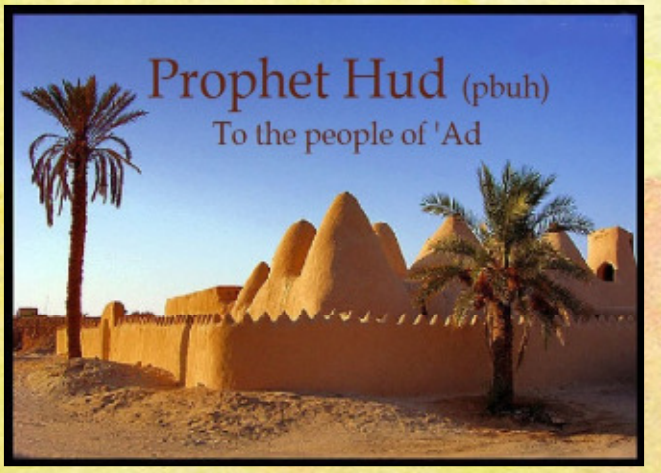

উল্লেখ্য যে, আযাব নাযিলের পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় নাবী হূদ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন ও তাঁরা উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পান (সূরা হূদ ঃ ৫৮)। অতঃপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। (সূরা আরাফ ঃ ৬৫)

‘আদ জাতির ধ্বংসের প্রধান কারণসমূহ ঃ

(ক) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহের মূল্যায়ন করেনি। যার ফলে তারা আল্লাহ্র আনুগত্য হ’তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং শয়তানের আনুগত্য বরণ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছিল;
(খ) আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহকে তাদের জন্য চিরস্থায়ী ভেবেছিল;
(গ) আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক উপাস্যের অসীলা পূজা শুরু করেছিল;
(ঘ) তারা আল্লাহ্র নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল;
(ঙ) তারা আল্লাহ্র আযাব থেকে নির্ভীক (ভয়হীন) হয়ে গিয়েছিল। যদিও তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত।
(চ) তারা অযথা উঁচু স্থানসমূহে সুউচ্চ টাওয়ার ও নিদর্শনসমূহ নির্মাণ করত। যা শুধুমাত্র অপচয় ব্যতীত কিছুই ছিল না (সূরা শু‘আরা ঃ ১২৮)।
(ছ) তারা অহেতুক মযবূত প্রাসাদসমূহ তৈরী করত এবং ভাবত যেন তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে (সূরা শু’আরা ঃ ১২৯)।
(জ) তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো (সূরা শু’আরা ঃ ১৩০)।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

(১) অহী-র বিধানকে অস্বীকার করা এবং অন্যায়ের উপর যিদ ও অহংকার প্রদর্শন করাই হ’ল পৃথিবীতে আল্লাহ্র আযাব নাযিলের প্রধান কারণ।
(২) আল্লাহ প্রেরিত আযাবের ধরন বিভিন্নরূপ হ’তে পারে। কিন্তু সেই আযাবকে ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের থাকে না।
(৩) বিলাসী, অপচয়কারী ও অত্যাচারী নেতাদের কারণেই জাতি আল্লাহ্র আযাবের শিকার হয়ে থাকে।
(৪) আল্লাহ্র আযাব যাদের উপর আপতিত হয়, তারা সকল যুগে নিন্দিত হয় এবং কখনোই তারা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।
(৫) আল্লাহ্র বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় চূড়ান্ত বিচারে দুনিয়াতেই আল্লাহ্র আযাবের শিকার হয়। উপরন্তু আখিরাতের আযাব তো থাকেই এবং তা হয় আরো কঠোর (সূরা ক্বলাম ঃ ৩৩)।

সালেহ (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ 'আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে সালেহ (আ.) সামূদ জাতির প্রতি নাবী হিসেবে প্রেরিত হন। 'আদ ও সামূদ জাতি একই দাদা 'ইরাম'-এর দু'টি বংশধারার নাম। সামূদ জাতি আরবের উত্তরপশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজ্‌র' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়ে থাকে। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও 'আদ জাতির মত শক্তিশালী ও বীরের জাতি ছিল। তারা পাথর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানারূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামূদী বর্ণমালার শিলালিপি খোদিত রয়েছে। অভিশপ্ত অঞ্চল হওয়ার কারণে এলাকাটি আজও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কেউ সেখানে বসবাস করে না।

সামূদ জাতির প্রতি সালেহ (আ.)-এর দাওয়াত ঃ এই জাতিকে সালেহ (আ.) সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শিরক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানালেন। তিনি যৌবনকালে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তখন থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত তিনি নিজ জাতিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা তাঁর উপরে ঈমান আনলেও শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করে।

সামূদ জাতির উপরে আপতিত আযাবের বিবরণ ঃ সালেহ (আ.)-এর নিরন্তর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটা বিষয় দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি ব্যর্থ হবেন এবং এর ফলে তাঁর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে। সেমতে তারা এসে তাঁর নিকটে দাবী করল যে, আপনি যদি আল্লাহ্‌র সত্যিকারের নাবী হন, তাহলে আমাদেরকে নিকটবর্তী 'কাতেবা' পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উট বের করে এনে দেখান। এ দাবী শুনে সালেহ (আ.) তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়, তবে তোমরা আমার নবুওয়াতের প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে কি-না। জেনে রেখ, উক্ত মু'জেযা প্রদর্শনের পরেও যদি তোমরা ঈমান না আনো, তা হলে আল্লাহ্‌র আযাবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে'। এতে সবাই স্বীকৃত হল ও উক্ত মর্মে অঙ্গীকার করল। তখন সালেহ (আ.) সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তার দু'আ কবুল করলেন এবং বললেন, 'আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উট প্রেরণ করব। তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং ধৈর্য ধারণ কর' (সূরা ক্বামার ঃ ২৭)। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে কম্পন দেখা দিল এবং একটি বিরাট পাথর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে নেতাদের দাবীর অনুরূপ একটি গর্ভবতী ও লাবণ্যবতী তরতাযা উট বেরিয়ে এল। সালেহ (আ.)-এর এই বিস্ময়কর মু'জেযা দেখে গোত্রের নেতা সহ তার সমর্থক লোকেরা সাথে সাথে মুসলিম হয়ে গেল। অবশিষ্টরাও হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু প্রধান ধর্মনেতা ও অন্যান্য সমাজ নেতাদের বাধার কারণে হ'তে পারল না। তারা উল্টা বলল, 'আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি...' (সূরা নামল ঃ ৪৭)। সালেহ (আ.) নেতাদের এভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে এবং পাল্টা তাঁকেই দায়ী করতে দেখে দারুণভাবে শংকিত হলেন যে, যেকোন সময়ে এরা আল্লাহ্‌র আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। একদিন তারা উটটিকে হত্যা করে।

উলেখ্য যে, উট হত্যার ঘটনার পর সালেহ (আ.) স্বীয় জাতিকে আল্লাহ্র নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, 'এখন থেকে তিনদিন তোমরা তোমাদের ঘরে আরাম করে নাও, এর পরেই আযাব নেমে আসবে। তারা বলল, আমরা জানতে চাই, এ শাস্তি কিভাবে আসবে, কোত্থেকে আসবে, এর লক্ষণ কী হবে? সালেহ (আ.) বললেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যাবে। পরের দিন শুক্রবার তোমাদের সবার মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কালো বর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৭-৭৮)

আযাবের ধরন ঃ সালেহ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে অবিশ্বাসী সকলের মুখমণ্ডল গভীর হলুদ বর্ণ ধারণ করল। কিন্তু তারা ঈমান আনল না বা তওবা করল না। বরং উল্টা সালেহ (আ.)-এর উপর চটে গেল ও তাঁকে হত্যা করার জন্য খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ও তৃতীয় দিন ঘোর কালো বর্ণ হয়ে গেল। তখন সবই নিরাশ হয়ে আযাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চতুর্থ দিন রবিবার সকালে সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সুগন্ধি মেখে অপেক্ষা করতে থাকে। (সূরা আ'রাফ ঃ ৯৩-৭৮) এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ এক গর্জন শোনা গেল। ফলে তারা নিজেদের ঘরের মধ্যেই নতজানু হয়ে পড়ে গেল। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৮; সূরা হূদ ঃ ৬৭-৬৮) এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এমনভাবে, যেন তারা কোনদিন সেখানে ছিল না'।

সামূদ জাতির ধ্বংস কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে নিয়ামতরাজি দান করেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। শুকরিয়া আদায় করলে সে আরও বেশী পায়। কিন্তু কুফরী করলে সে ধ্বংস হয় এবং উক্ত নিয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

২. দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অন্যদের আগে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয় ও এজন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৩. অহংকারীদের অন্তর শক্ত হয়। তারা এলাহী আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেও তাকে তাচ্ছিল্য করে। যেমন নয় নেতা ১ম দিন গযবে ধ্বংস হলেও অন্যেরা তওবা না করে তাচ্ছিল্য করেছিল। ফলে অবশেষে ৪র্থ দিন তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

৪. আল্লাহ যালেম জনপদকে ধ্বংস করেন অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

৫. আল্লাহ সংশোধনকামী জনপদকে কখনোই ধ্বংস করেন না।

৬. কখনো একজন বা দু' জনের কারণে গোটা সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রী হত্যাকারী ছিল মাত্র দু'জন। অতএব মুষ্টিমেয় কুচক্রীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সমাজকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।

৭. কুচক্রীদের কৌশল আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। যেমন সামূদ কওমের নেতারা বুঝতে না পেরে অযথা দম্ভ করেছিল (সূরা নামল ২৭/৫০-৫১)।

৮. আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই দুনিয়াতে ছোট-খাট শাস্তির আস্বাদন করিয়ে থাকেন ও তাদেরকে ভয় দেখান (সূরা ইসরা ১৭/৫৯; সূরা সাজদাহ ৩২/২১)।

৯. সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে অবশেষে সত্য সেবীদেরই জয় হয়। যেমন সালেহ (আ.) ও তাঁর ঈমানদার দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা এলাহী আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন ও মিথ্যার পূজারী শক্তিশালীরা ধ্বংস হয়েছিল।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ ইবরাহীম (আ.) ছিলেন নূহ (আ.)-এর সম্ভবত এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ থেকে ইবরাহীম পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। সালেহ (আ.)-এর প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহীমের আগমন ঘটে।

পিতাকে ও নিজ সম্প্রদায়কে একত্রে দাওয়াত ঃ 'যখন সে স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর'? । তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি'। 'সে বলল, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি'? (সূরা শু'আরা ঃ ৭২) 'অথবা তারা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি'? । 'তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত' (সূরা শু'আরা ঃ ৭৪)। (সূরা শু'আরা ঃ ৬৯-৭৪)

তারকা পূজারীদের সাথে বিতর্ক ঃ মূর্তি পূজারীদের সাথে বিতর্কের পরে তিনি তারকাপূজারী নেতাদের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারাও মূর্তি পূজারীদের ন্যায় নিজ নিজ বিশ্বাসে অটল রইল। অবশেষে তাঁর সাথে তাদের নেতাদের তর্কযুদ্ধ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যে কা'বা গৃহকে ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ করেন এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য। তারা সেখানেই মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। অথচ মুখে আল্লাহকে স্বীকার করত এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত।

ইবরাহীম মূর্তি ভাঙ্গলেন ঃ তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। যাতে ওরা ফিরে এসে ওদের মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য দেখতে পায়। হয়তবা এতে তাদের অনেকের মধ্যে হুঁশ ফিরবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান জাগ্রত হবে ও শিরক থেকে তাওবা করবে। অতঃপর তিনি দেবালয়ে ঢুকে পড়লেন ও দেব-দেবীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, (তোমাদের সামনে এত নযর-নেয়ায রয়েছে)। অথচ 'তোমরা তা খাচ্ছ না কেন? কি ব্যাপার তোমরা কথা বলছ না কেন? তারপর তিনি ডান হাতে রাখা (সম্ভবতঃ কুড়াল দিয়ে) ভীষণ জোরে আঘাত করে সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিলেন (সূরা সাফফাত ঃ ৯১-৯৩)। তবে বড় মূর্তিটাকে পূর্বাবস্থায় রেখে দিলেন, যাতে লোকেরা তার কাছে ফিরে যায় (সূরা আম্বিয়া ঃ ৫৮)।

মেলা শেষে লোকজন ফিরে এল এবং যথারীতি দেবমন্দিরে গিয়ে প্রতিমাগুলির অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। 'তারা বলাবলি করতে লাগল, এটা নিশ্চয়ই ইবরাহীমের কাজ হবে। কেননা তাকেই আমরা সবসময় মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বলতে শুনি। অতঃপর ইবরাহীমকে সেখানে ডেকে আনা হল এবং জিজ্ঞেস করল, 'হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছ'? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬২)। ইবরাহীম বললেন, 'বরং এই বড় মূর্তিটাই একাজ করেছে। না হলে এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৩)। সম্প্রদায়ের নেতারা একথা শুনে লজ্জা পেল এবং মাথা নীচু করে বলল, 'তুমি তো জানো যে, এরা কথা বলে না'। 'তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৫-৬৬)। তিনি আরও বললেন, 'তোমরা এমন বস্তুর পূজা কর, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর'? 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন' (সূরা সাফফাত ঃ ৯৫-৯৬)। 'ধিক তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর, ওদের জন্য। তোমরা কি বুঝ না'? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৭)।

তারপর যা হবার তাই হল। জিদ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা ইবরাহীমকে চূড়ান্ত শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, একে আর বাঁচতে দেয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, একে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মারতে হবে, যেন কেউ এর দলে যেতে সাহস না করে। তারা তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার

প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং সেটা বাদশাহ নমরূদের কাছে পেশ করল। সম্রাটের মন্ত্রী ও দেশের প্রধান পুরোহিতের ছেলে ইবরাহীম। অতএব তাকে সরাসরি সম্রাটের দরবারে আনা হল।

নমরূদের সঙ্গে বিতর্ক ও অগ্নি পরীক্ষা ঃ নমরূদ ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করায় সে উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে একমাত্র উপাস্য ভেবেছিল। তাই সে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করল, বল তোমার উপাস্য কে? নমরূদ ভেবেছিল, ইবরাহীম তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে। কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইবরাহীম জবাব দিলেন, 'আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন'। মোটাবুদ্ধির নমরূদ বলল, 'আমিও বাঁচাই ও মারি'। ইবরাহীম তখন বললেন, 'আমার আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, আপনি তাকে পশ্চিম দিক হ'তে উদিত করুন'। 'অতঃপর কাফির (নমরূদ) এতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো' (সূরা বাক্বারা ঃ ২৫৮)। কওমের নেতারাই যেখানে পরাজয়কে মেনে নেয়নি, সেখানে দেশের একচ্ছত্র সম্রাট কেন পরাজয়কে মেনে নিবেন। যথারীতি তিনিও অহংকারে ফেটে পড়লেন এবং ইবরাহীমকে জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে জনগণকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বললেন, 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৮)। আল্লাহ্র নির্দেশ এল 'হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৯)। অতঃপর ইবরাহীম (আ.) মুক্তি পেলেন।

হিজরতের পালা ঃ ইবরাহীম (আ.) সত্তর বছর বয়সের পর অগ্নি পরীক্ষার সম্মখীন হন। এই দীর্ঘ দিন দাওয়াত দেয়ার পরেও নিজের স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত ব্যতীত কেউ প্রকাশ্যে ঈমান আনেনি। ফলে পিতা ও সম্প্রদায় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। ইবরাহীম (আ.) যথারীতি মিসর থেকে কেন'আনে ফিরে এলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন তার প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আ.)।

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসার নির্দেশ পান। অতঃপর এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি সহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আ.) একাকী রেখে আসেন। হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তখন হাজেরা বলে উঠলেন, 'তা হলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু'একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানির অভাবে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে। পাগলপরা হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌড়াতে থাকেন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ মাথা আর ও মাথায়। এভাবে সপ্তমবারে তিনি দূর থেকে দেখেন যে, বাচ্চার পায়ের কাছ থেকে মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার পানি। ছুটে এসে বাচ্চাকে কোলে নিলেন অসীম মমতায়। স্নিগ্ধ পানি পান করে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। হঠাৎ অদূরে একটি আওয়ায শুনে তিনি চমকে উঠলেন। উনি জিবরাঈল (আ.)। বলে উঠলেন, 'আপনারা ভয় পাবেন না। এখানেই আল্লাহ্র ঘর। এই সন্তান ও তার পিতা এ ঘর সত্ত্বর পুন নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না'। বলেই শব্দ মিলিয়ে গেল'।

পুত্র কুরবানী ঃ একমাত্র শিশু পুত্র ও তার মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইবরাহীম (আ.) মাঝেমধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা-শুনা করতেন। এভাবে ইসমাঈল 'যখন (ইসমাঈল) পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে আমার বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন বল তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন' (সূরা সাফফাত ঃ ১০২)।

লূত (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ লূত (আ.) ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি 'বাবেল' শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে চলে আসেন। আল্লাহ তা'আলা লূত (আ.)-কে নবুওয়াত দান করেন এবং কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, সা'বাহ ও সা'ওয়াহ ১০৫ নামে বড় বড় পাঁচটি শহর ছিল। লূত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। এসব ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 'সাদূম' সম্পর্কে সকলে একমত। বাকী শহরগুলির নাম কি, সেগুলির সংখ্যা তিনটি, চারটি না ছয়টি, সেগুলিতে বসবাসকারী লোকজনের সংখ্যা কয়শত, কয় হাজার বা কয় লাখ ছিল, সেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা, যা কেবল ইতিহাসের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কুরআন ও হাদীছে শুধু মূল বিষয়বস্তুর বর্ণনা এসেছে, যা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয়। উল্লেখ্য যে, লূত (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৫টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

লূত (আ.)-এর দাওয়াত ঃ লূত (আ.)-এর কওম আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। দুনিয়ার উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় তারা চূড়ান্ত বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সমকামিতার মত নোংরামিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বেকার কোন জাতির মধ্যে দেখা যায়নি। এই কওমের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন'। (শু'আরা ঃ ১৬২-১৬৫)

লূত (আ.)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি ঃ নিজ কওমের প্রতি লূত (আ.)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি মর্মান্তিক রূপে প্রতিভাত হয়। তারা এতই হঠকারী ও নিজেদের পাপকর্মে অন্ধ ও নির্লজ্জ ছিল যে, তাদের কেবল একটাই জবাব ছিল, তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি? কিন্তু কোন নাবীই স্বীয় কওমের ধ্বংস চান না। তাই তিনি সবর করেন ও তাদেরকে বারবার উপদেশ দিতে থাকেন। তখন তারা অধৈর্য হয়ে বলে যে, 'এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। এই লোকগুলি সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়' (সূরা আ'রাফ ঃ ৮২; সূরা নামল ঃ ৫৬)।

ধ্বংসস্থলের বিবরণ ঃ কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়েত' বা 'বাহরে লূত' অর্থাৎ 'মৃত সাগর' বা 'লূত সাগর' নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। যেটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ নীচু এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশী। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বা 'মরু সাগর' বলা হয়েছে। সাদূম উপসাগর বেষ্টক এলাকায় এক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষ ও উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্ত

রে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল-তাজা উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধূলি-বালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। Natron ও পেট্রোল তো আছেই। এই গন্ধক উল্কা পতনের অকাট্য প্রমাণ।

কেননা এগুলি মূলতঃ মানুষের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য' ... এবং বিশ্বাসীদের জন্য' (সূরা হিজর ঃ ৭৫, ৭৭)।

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা ঃ তখন উক্ত জনপদে লূত-এর পরিবারটি ব্যতীত মুসলিম ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমরা সেখানে একটি বাড়ী ব্যতীত কোন মুসলিম পাইনি' (সূরা যারিয়াত ঃ ৩৬)। কুরআনী বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত আযাব হ'তে মাত্র লূত-এর পরিবারটি নাজাত পেয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত'। (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৩)

'ক্বিয়ামতের দিন অনেক নাবীর একজন উম্মতও থাকবে না'। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

এখানে লক্ষণীয় যে, নাবীপত্নী হয়েও লূতের স্ত্রী আযাব থেকে রেহাই পাননি। আল্লাহ নূহ পত্নী ও লূত পত্নীকে ক্বিয়ামতের দিন বলবেন- 'যাও জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও'। (সূরা তাহরীম ঃ ১০)

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. বান্দার প্রতিটি ভাল কিংবা মন্দ কর্ম আল্লাহ্র সরাসরি দৃষ্টিতে রয়েছে। বান্দার সৎকর্মে তিনি খুশী হন ও মন্দ কর্মে অখুশী হন।
২. নাবী কিংবা সংস্কারক পাঠিয়ে উপদেশ না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন অবাধ্য কওমকে ধ্বংসকারী আযাবে গ্রেফতার করেন না।
৩. ঈমান না থাকলে কেবল বংশ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষকে আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যেমন লূত (আ.)-এর স্ত্রী আযাব থেকে রক্ষা পাননি।

ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ ইসমাঈল (আ.) ছিলেন পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর।

শিশু বয়স ও কৈশর ঃ শিশু বয়সে তাঁকে ও তাঁর মাকে পিতা ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। সেখানে ইবরাহীমের দু'আর বরকতে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। ১৪ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে ঘটে কুরবানীর ঘটনা। পিতা ইবরাহীম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কুরবানীর উক্ত ঘটনায় শতবর্ষীয় পিতা ইবরাহীমের ভূমিকা যাই-ই থাকুক না কেন চৌদ্দ বছরের তরুণ ইসমাঈলের ঈমান ও আত্মত্যাগের নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই। তাই ঐ সময় নাবী না হলেও নাবীপুত্র ইসমাঈলের আল্লাহভক্তি ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল তার কথায় ও কর্মে। এরপর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনি কা'বা গৃহ নির্মাণে শরীক হন এবং কা'বা নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তা'আলা তা নিজ যবানীতে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন (সুরা বাক্বারাহ ঃ ১২৭-১২৯)।

চরিত্র ঃ তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী' যা তিনি যবহের পূর্বে পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন' (ছাফফাত ঃ ১০২)।

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং কাবা ঘর নির্মান ঃ তিনি পিতার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত ছিলেন। পিতা-পুত্র মিলে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। (সহীহ বুখারী)

ইসমাঈল (আ.) ও ইসহাক (আ.) ছিলেন দুই ভাই।

ইসহাক (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ ইসহাক ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী সারাহ-এর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আ.)-এর চৌদ্দ বছরের ছোট। এই সময় সারাহ্র বয়স ছিল ৯০ এবং ইবরাহীমের বয়স ছিল ১০০। অতি বার্ধ্যক্যের হতাশ বয়সে বন্ধ্যা নারী সারাহ্-কে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফিরিশতা আগমনের ঘটনা আমরা ইতিপূবে বিবৃত হয়েছে।

নবুওয়াত লাভ ঃ পবিত্র কুরআনে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সূরা হূদ ৭১-৭৩ আয়াতে, হিজর ৫১-৫৬ আয়াতে এবং যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াতে- যা আমরা ইবরাহীমের জীবনীতে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ ইসমাঈলকে দিয়ে যেমন মক্কার জনপদকে তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, তেমনি ইসহাক্বকে নবুওয়াত দান করে তার মাধ্যমে শাম-এর বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদ করেছিলেন।

মৃত্যু ঃ ইসহাক্ব (আ.) ১৮০ বছর বয়স পান। তিনি কেন'আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মাধ্যমে হেবরনে পিতা ইবরাহীমের কবরের পাশে সমাহিত হন। স্থানটি এখন 'আল-খালীল' নামে পরিচিত'। উল্লেখ্য যে, ইসহাক্ব (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৪টি সূরায় ৩৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ ইসহাক্ব (আ.)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকূব-এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকূব নাবী হন। ইয়াকূবের অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল'। যার অর্থ আল্লাহ্র দাস। ইয়াকূব তার মামার বাড়ী ইরাকের হারান যাবার পথে রাত হয়ে গেলে কেন'আনের অদূরে একস্থানে একটি পাথরের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সে অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, একদল ফিরিশতা সেখান থেকে আসমানে উঠানামা করছে। এরি মধ্যে আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'অতিসত্ত্বর আমি তোমার উপরে বরকত নাযিল করব, তোমার সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দেব, তোমাকে ও তোমার পরে তোমার উত্তরসূরীদের এই মাটির মালিক করে দেব'। তিনি ঘুম থেকে উঠে খুশী মনে মানত করলেন, যদি নিরাপদে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন, তা হলে এই স্থানে তিনি একটি ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহ তাকে যা রূযী দেবেন তার এক দশমাংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবেন'। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে পাথরটির উপরে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে তিনি ফিরে এসে সেটাকে চিনতে পারেন। তিনি স্থানটির নাম রাখলেন, আল্লাহ্র ঘর। এই স্থানেই বর্তমানে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' অবস্থিত, যা পরবর্তীতে প্রায় ১০০০ বছর পরে সুলায়মান (আ.) পুনঃনির্মাণ করেন। মূলতঃ এটিই ছিল 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসের' মূল ভিত্তি ভূমি, যা কা'বা গৃহের চল্লিশ বছর পরে ফিরিশতাদের দ্বারা কিংবা আদম পুত্রদের হাতে কিংবা ইসহাক্ব (আ.) কর্তৃক নির্মিত হয়। নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ ইয়াকূব (আ.)-কে স্বপ্নে দেখান এবং তাঁর হাতে সেখানে পুনরায় ইবাদতখানা তৈরী হয়। শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন 'ইউসুফ'। অতঃপর দ্বিতীয় পুত্র বেনিয়ামীনের জন্মের পরেই তিনি মারা যান। ইয়াকূবের ১২ পুত্রের মধ্যে ইউসুফ নাবী হন। তিনি ১৪৭ বছর বয়সে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতা ইসহাক (আ.)-এর কবরের পাশে সমাধিস্থ হন।

ইয়াকূবের অছিয়ত ঃ ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে অসিয়ত করেন। যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৩২)। 'তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক্বের উপাস্যের ইবাদত করব- যিনি একক উপাস্য এবং আমরা সবাই তাঁর প্রতি সমর্পিত' (সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৩৩)। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব প্রমুখ নাবীগণের ধর্ম ছিল 'ইসলাম'। তাদের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদ।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

ইবরাহীম ও ইয়াকূবের অছিয়তে এটা প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের জন্য দুনিয়াবী ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ঈমানী সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার অছিয়ত করে যাওয়াই হ'ল দূরদর্শী পিতার প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ ইউসুফ (আ.)-এর পিতা ছিলেন ইয়াকূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম (আ.) । তাঁরা সবাই কেন'আন বা ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন । ইয়াকুব (আ.) এর বারো পুত্রের মধ্যে মাত্র ইউসুফ নাবী হয়েছিলেন । তাঁর রূপ-লাবণ্য ছিল অতুলনীয় । রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি মি'রাজ রজনীতে ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে দেখলাম যে, আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করেছেন' । (মুসলিম)

শৈশবে ইউসুফের লালন-পালন ঃ ইউসুফ-এর জন্মের কিছুকাল পরেই বেনিয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন । বেনিয়ামীন জন্মের পরপরই তাদের মায়ের মৃত্যু ঘটে । তখন মাতৃহীন দুই শিশুর লালন-পালনের ভার তাদের ফুফুর উপরে অর্পিত হয় । আল্লাহ তা'আলা ইউসুফকে এত বেশী রূপ-লাবণ্য এবং মায়াশীল ব্যবহার দান করেছিলেন যে, যেই-ই তাকে দেখত, সেই-ই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত । ফুফু তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন । একদণ্ড চোখের আড়াল হতে দিতেন না । এদিকে বিপত্নীক ইয়াকূব (আ.) মাতৃহীনা দুই শিশু পুত্রের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর দুর্বল এবং সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন ।

ভাইদের হিংসার শিকার হলেন ঃ ইয়াকূব (আ.) তার প্রতি অধিক স্নেহশীল ছিলেন । আর সেকারণে সৎ ভাইয়েরাও ছিল অধিক হিংসাপরায়ণ । বস্তুতঃ এই হিংসাত্মক আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ইউসুফের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান ।

ইউসুফ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হলেন ঃ দশ জন বিমাতা ভাই মিলে ইউসুফকে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিল । তারা একদিন পিতা ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে এসে ইউসুফকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আনন্দ ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব করল । তারা পিতাকে বলল যে, 'আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন । সে আমাদের সঙ্গে যাবে, তৃপ্তিসহ খাবে আর খেলাধূলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব' । জবাবে পিতা বললেন, আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে' । 'তারা বলল, আমরা এতগুলো ভাই থাকতে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, তা হলে তো আমাদের সবই শেষ হয়ে যাবে' (সূরা ইউসুফ ঃ ১২-১৪) ।

ছেলেদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি রাযী হলেন । কিন্তু তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যাতে তারা ইউসুফকে কোনরূপ কষ্ট না দেয় এবং তার প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখে । কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছেই তারা ইউসুফকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হল । তখন বড় ভাই ইয়াহুদা তাদের বাধা দিল এবং পিতার নিকটে তাদের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল । অবশেষে বড় ভাই একা পেরে না উঠে প্রস্তাব করল, বেশ তবে ওকে হত্যা না করে বরং ঐ দূরের একটা পরিত্যক্ত কূয়ায় ফেলে দাও । যাতে কোন পথিক এসে ওকে উঠিয়ে নিয়ে যায় । তাতে তোমাদের দু'টো লাভ হবে । এক- সে পিতার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে ও তোমরা তখন পিতার নিকটবর্তী হবে । দুই- নিরপরাধ বালককে হত্যা করার পাপ থেকে তোমরা বেঁচে যাবে । বড় ভাইয়ের কথায় সবাই একমত হয়ে

ইউসুফকে কুয়ার ধারে নিয়ে গেল। এ সময় তারা তার গায়ের জামা খুলে নিল এবং তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল।

পিতার নিকটে ভাইদের কৈফিয়ত ঃ ইউসুফকে অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে একটা ছাগলছানা যবেহ করে তার রক্ত ইউসুফের পরিত্যক্ত জামায় মাখিয়ে তারা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল এবং কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাযির হয়ে ইউসুফকে বাঘে নিয়ে গেছে বলে কৈফিয়ত পেশ করল। প্রমাণ স্বরূপ তারা ইউসুফের রক্ত মাখা জামা পেশ করল। কিন্তু পিতা ইয়াকুব (আ.) অহীর মাধ্যমে তিনি সবই জানতে পারেন।

কাফেলার হাতে ইউসুফ ঃ সিরিয়া থেকে মিসরে যাওয়ার পথে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা পথ ভুলে জঙ্গলের মধ্যে উক্ত পরিত্যক্ত কূয়ার নিকটে এসে তাঁবু ফেলে। (সূরা ইউসুফ ঃ ১৯) তারা পানির সন্ধানে তাতে বালতি নিক্ষেপ করল। কিন্তু বালতিতে উঠে এল তরতাযা সুন্দর একটি বালক 'ইউসুফ'। অনিন্দ্য সুন্দর বালক দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো 'কি আনন্দের কথা। এ যে একটি বালক!' এরপর তারা তাকে মালিকবিহীন পণ্যদ্রব্য মনে করে লুকিয়ে ফেলল। কেননা সেযুগে মানুষ কেনাবেচা হ'ত।

ইউসুফ মিসরের অর্থমন্ত্রীর গৃহে ঃ মিসরের অর্থমন্ত্রীর উপাধি ছিল 'আযীয' বা 'আযীযে মিসর'। ইউসুফকে ক্রয় করে এনে তিনি তাকে স্বীয় স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন এবং বললেন, একে সন্তানের ন্যায় উত্তম রূপে লালন-পালন কর। এর থাকার জন্য উত্তম ব্যবস্থা কর। ভবিষ্যতে সে আমাদের কল্যাণে আসবে'। বস্তুতঃ ইউসুফের কমনীয় চেহারা ও নম্র ভদ্র ব্যবহারে তাদের মধ্যে সন্তানের মমতা জেগে ওঠে। আযীযে মিসরের গৃহে কয়েক বছর পুত্র স্নেহে লালিত পালিত হয়ে ইউসুফ অতঃপর যৌবনে পদার্পণ করলেন। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও হিকমত দান করলাম। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' (সূরা ইউসুফ ঃ ২২)।

ভাইদের মিসরে আগমন ঃ মিসরের দুর্ভিক্ষ সে দেশের সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দূর-দূরান্ত এলাকা সমূহে বিস্তৃত হয়। ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূবের আবাসভূমি কেন'আনও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হয়। ফলে ইয়াকূবের পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। এ সময় ইয়াকূব (আ.)-এর কানে এ খবর পৌঁছে যায় যে, মিসরের নতুন বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু। তিনি স্বল্পমূল্যে এক উট পরিমাণ খাদ্যশস্য অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করছেন। এ খবর শুনে তিনি পুত্রদের বললেন, তোমরাও মিসরে গিয়ে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো। সেমতে দশ ভাই দশটি উট নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। বৃদ্ধ পিতার খিদমত ও বাড়ী দেখাশুনার জন্য ছোট ভাই বেনিয়ামীন একাকী রয়ে গেল। কেন'আন থেকে মিসরের রাজধানী প্রায় ২৫০ মাইলের ব্যবধান। যথাসময়ে দশভাই কেন'আন থেকে মিসরে উপস্থিত হল। ইউসুফ (আ.) তাদেরকে চিনে ফেললেন।

ইউসুফের আত্মপ্রকাশ এবং ভাইদের ক্ষমা প্রার্থনা ঃ পরিবারের অনটনের কথা শুনে এবং পিতার অন্ধত্ব ও অসহায় অবস্থার কথা শুনে ইউসুফ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজেকে প্রকাশ করে দিলেন এবং বললেন, ‘তোমাদের কি জানা আছে যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে’ (৮৯)। ‘তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ, আর এ হল আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না’ (৯০)। ‘তারা বলল, ‘আল্লাহ্র কসম! আমাদের উপরে আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম’ (৯১)। ‘ইউসুফ বললেন, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু’ (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৯-৯২)।

পিতার নিকটে ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা ঃ প্রকৃত ঘটনা সবার নিকটে পরিষ্কার হয়ে গেলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত বিমাতা ভাইয়েরা সবাই এসে পিতার কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং আল্লাহ্র নিকটে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করল।

ইউসুফের জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

(১) ইউসুফের কাহিনীতে একথা পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই পরিণামে বিজয়ী করেন। এই বিজয় তো আখিরাতে অবশ্যই। তবে দুনিয়াতেও হ’তে পারে।

(২) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা ও সুন্দরভাবে ধৈর্যধারণ করাই হ’ল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।

(৩) নাবীগণ মানুষ ছিলেন। তাই মনুষ্যসূলভ প্রবণতা ইয়াকূব ও ইউসুফের মধ্যেও ছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক তাক্বওয়াশীল বান্দার প্রতি একইরূপ অনুগ্রহ করে থাকেন।

(৪) ইউসুফের কাহিনী কেবল তিক্ত বাস্তবতার এক অনন্য জীবন কাহিনী নয়। বরং বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর উপরে একান্ত নির্ভরতার এক বাস্তব দলীল।

আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)

আইয়ূব (আ.)-কে আল্লাহ কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সে পরীক্ষায় আইয়ূব উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যার পুরষ্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে হারানো নি'য়ামত সমূহের দ্বিগুণ ফেরৎ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে বিপদে ধৈর্যধারণ করায় এবং আল্লাহ্র পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ আইয়ূবকে 'সবরকারী' হিসাবে ও 'সুন্দর বান্দা' হিসাবে প্রশংসা করেছেন (সূরা সোয়াদ ঃ ৪৪)। প্রত্যেক নাবীকেই কঠিন পরীক্ষাসমূহ দিতে হয়েছে। তারা সকলেই সে সব পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেছেন ও উত্তীর্ণ হয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার দু'আ কবুল করেছিলাম এবং তার দুঃখকষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম' (আম্বিয়া ঃ ৮৪)। কীভাবে দূর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাকে ভূমিতে পদাঘাত করতে বলেন। অতঃপর সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ধারা বেরিয়ে আসে। যাতে গোসল করায় তার দেহের উপরের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত পানি পান করায় তার ভিতরের কষ্ট দূর হয়ে যায় (সূরা সোয়াদ ৪২)।

সহীহ বুখারীতে আইয়ূবের উপর এক ঝাঁক সোনার টিড্ডি পাখি এসে পড়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটা হল আইয়ূবের সুস্থতা লাভের পরের ঘটনা। এর দ্বারা আল্লাহ বিপদমুক্ত আইয়ূবের উচ্ছ্বল আনন্দ পরখ করতে চেয়েছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ পেয়ে বান্দা কত খুশী হ'তে পারে, তা দেখে যেন আল্লাহ নিজেই খুশী হন। এজন্য আইয়ূবকে খোঁচা দিয়ে কথা বললে অনুগ্রহ বিগলিত আইয়ূব বলে ওঠেন, 'আল্লাহ্র বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই'। অর্থাৎ বান্দা সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রহমত ও বরকতের মুখাপেক্ষী। নিঃসন্দেহে উক্ত ঘটনাটিও একটি মু'জেযা। আইয়ূব (আ.) ৭০ বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন। পরীক্ষা থেকে মুক্ত হবার অনেক পরে ৯৩ বছর বা তার কিছু বেশী বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) বড় পরীক্ষায় বড় পুরষ্কার লাভ হয়। ধন-সম্পদ ও পুত্র-কন্যা হারিয়ে রোগে পতিত হয়েও আইয়ূব (আ.) আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্যুত হননি এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হননি।

(২) প্রকৃত মুমিনগণ আনন্দে ও বিষাদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রহমতের আকাংখী থাকেন। বরং বিপদে পড়লে তারা আরও বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হন। কোন অবস্থাতেই নিরাশ হন না।

(৩) প্রকৃত স্ত্রী তিনিই, যিনি সর্বাবস্থায় নেককার স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। আইয়ূবের স্ত্রী 'লাইয়া' ছিলেন বিশ্বের পণ্যবতী মহিলাদের শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত।

(৪) প্রকৃত সবরকারীর জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আইয়ূব ও লাইয়া দম্পতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫) শয়তান প্রতি মুহূর্তে নেককার মানুষের শত্রু। শিরকের মাধ্যমে সে সর্বদা মুমিনকে আল্লাহ্র পথ হ'তে সরিয়ে নিতে চায়। একমাত্র আল্লাহ দৃঢ় তাওহীদ বিশ্বাসই মুমিনকে শয়তান হ'তে রক্ষা করতে পারে।

শো'আয়েব (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হল 'আহলে মাদইয়ান'। 'মাদইয়ান' হল লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর 'মো'আন'-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুফরী করা ছাড়াও এই জনপদের লোকেরা ব্যবসা কালে ওজন ও মাপে কম দিত, রাহাজানি ও লুটপাট করত। অন্যায় পথে জনগণের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করত। শো'আয়েব (আ.) এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কওমে লূত-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন (সূরা হূদ ঃ ৮৯)। উলেখ্য যে, শো'আয়েব (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

শো'আয়েব (আ.)-এর দাওয়াত ঃ তিনি তাঁর কওমকে যে দাওয়াত দেন, তা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শো'আয়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর। মানুষকে তাদের মালামাল কম দিয়ো না। ভূপৃষ্ঠে সংস্কার সাধনের পর তোমরা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'। 'তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, ঈমানদারদের হুমকি দেবে, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আধিক্য দান করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের'। 'আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং আরেক দল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। কেননা তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী' (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৫-৮৭)

শো'আয়েব (আ.)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি ঃ শো'আয়েব (আ.)-এর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ দাওয়াত তাঁর উদ্ধত কওমের নেতাদের হৃদয়ে রেখাপাত করল না। তারা বরং আরও উদ্ধত হয়ে তাঁর দরদ ভরা সুললিত বয়ান ও অপূর্ব চিত্তহারী বাগ্মীতার জবাবে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের পাপিষ্ঠ নেতাদের ন্যায় নাবীকে প্রত্যাখ্যান করল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য করল।

আহলে মাদইয়ানের উপরে আপতিত আযাবের বিবরণ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপরে প্রথমে সাতদিন এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয় যে, তারা দহন জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন কওমের লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে দৌঁড়ে এল। এভাবে সবাই জমা হবার পর হঠাৎ আকাশ থেকে ভীষণ শব্দ এল। নীচের দিকে ভূমিকম্প শুরু হল এবং মেঘমালা হ'তে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। এভাবে কোনরূপ

গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই আল্লাহদ্রোহীরা সবাই পায়ে হেঁটে স্বেচ্ছায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয় এবং চোখের পলকে সবাই নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব ধ্বংসস্থল নযরে পড়ে। আল্লাহ বলেন, 'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করতো! এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা ক্বাসাস ঃ ৫৮)। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে' (সূরা হিজর ঃ ৭৫)।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) শো'আয়েব (আ.) একটি সম্ভ্রান্ত গোত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। নবুঅতের সম্পদ ছাড়াও তিনি দুনিয়াবী সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিলেন।

(২) কওমের নেতারা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান মানতে প্রস্তুত থাকলেও বৈষয়িক জীবনে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ মানতে রাযী ছিল না।

(৩) আল্লাহকে স্বীকার করলেও তাদের মধ্যে অসীলা পূজা ও মূর্তিপূজার শিরকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।

(৪) বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসমপূজা ছেড়ে নির্ভেজাল তাওহীদের সংস্কার ধর্মী দাওয়াত তারা কবুল করতে প্রস্তুত ছিল না।

(৫) মূলতঃ দুনিয়া পূজা ও প্রবৃত্তি পূজার কারণেই তারা শিরকী রেওয়াজ এবং বান্দার হক বিনষ্টকারী অপকর্ম সমূহের উপরে যিদ ধরেছিল।

(৬) সকল ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করতে হবে এবং প্রতিদান কেবল তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

(১১) শিরক-বিদ'আত ও যুলুম অধ্যুষিত সমাজে তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

(১২) চূড়ান্ত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটেই ফায়সালা চাইতে হবে।

মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)

মূসা ও ফিরাঊনের কাহিনী ঃ ফিরাঊন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ'তে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। মিসর সম্রাট ফিরাঊন জ্যোতিষীদের মাধ্যমে যখন জানতে পারলেন যে, অতি সত্বর ইস্রাঈল বংশে এমন একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। তখন উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসেবে ফিরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে হত্যার নির্দেশ দিল।

মূসা ও হারূণের জন্ম ঃ শাসকদল ক্বিবতীরা ফিরাঊনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, এভাবে পুত্র সন্তান হত্যা করায় বনু ইস্রাঈলের কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘাটতি হচ্ছে। যাতে তাদের কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তখন ফিরাঊন এক বছর অন্তর অন্তর পুত্র হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে বাদ পড়া বছরে হারূণের জন্ম হয়। কিন্তু হত্যার বছরে মূসার জন্ম হয়। ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আ.)-এর মায়ের অন্তরে ভালবাসা ঢেলে দেন।

মূসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হলেন ঃ ফিরাঊনের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী পিতা-মাতা প্রিয় সন্তানকে সিন্দুকে ভরে বাড়ীর পাশের নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। (সূরা ক্বাসাস ঃ ৭) অতঃপর স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে (সূরা ক্বাসাস ঃ ১১) সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল (সূরা ত্ব-হা ঃ ৪০)। এক সময় তা ফিরাঊনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফিরাঊনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফিরাঊন তাকে বনু ইস্রাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ফিরাঊন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মূসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় কমনীয়তা দান করেছিলেন (সূরা ত্ব-হা ঃ ৩৯)। যাকে দেখলেই মায়া পড়ে যেত। ফিরাঊনের পাষাণ হৃদয় গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফিরাঊনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন, 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি'। আল্লাহ বলেন, 'অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না' (সূরা ক্বাসাস ঃ ৯)।

ফিরাঊনের ঘরে মূসা ঃ মূসা এক্ষণে ফিরাঊনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু মূসা কারুরই বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, 'আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম' (সূরা ক্বাসাস ঃ ১২)। এমন সময় অপেক্ষারত মূসার বোন বলল, 'আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী'? (সূরা ক্বাসাস ঃ ১২)। রাণীর সম্মতিক্রমে মূসাকে প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হল। মূসা খুশী মনে মায়ের দধু পান করলেন। এভাবে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে মূসা তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন।

যৌবনে মূসা ঃ দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষে মূসা অতঃপর ফিরাঊন-পুত্র হিসেবে তার গৃহের মধ্যে বড় হতে থাকেন। এভাবে 'যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হলেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন'। (সূরা ক্বাসাস ঃ ১৪)

মূসার পরীক্ষা সমূহ ঃ নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর প্রধান পরীক্ষা ছিল তিনটি। যথা ঃ (১) হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া (২) মাদিয়ানে হিজরত (৩) মাদিয়ান থেকে মিসর যাত্রা। অতঃপর নবুওয়াত লাভের পর তাঁর পরীক্ষা হয় প্রধাণতঃ চারটি ঃ (১) জাদুকরদের মুকাবিলা (২) ফিরাঊনের যুলুমসমূহ মুকাবিলা (৩) সাগরডুবির পরীক্ষা (৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান।

মূসা (আ.)-এর মিসরে প্রত্যাবর্তন ঃ ফিরাঊন ও তার পারিষদবর্গের বিরুদ্ধে অলৌকিক লাঠি ও আলোকিত হস্ত তালুর দু'টি নিদর্শন নিয়ে মূসা (আ.) মিসরে পৌঁছলেন (ক্বাসাস ঃ ৩২)।

মূসার দাওয়াতের পর ফিরাঊনী অবস্থান ঃ মূসার মো'জেযা দেখে ফিরাঊন ও তার পরিষদবর্গ দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। ফিরাঊন মূসা (আ.)-কে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আগমন করেছ'? 'তা হলে আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা ওয়াদার দিন ধার্য কর, যার খেলাফ আমরাও করব না, তুমিও করবে না'। 'মূসা বললেন, 'তোমাদের ওয়াদার দিন হবে তোমাদের উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নেই লোকজন সমবেত হবে' (সূরা ত্ব-হা ঃ ৫৭-৫৯)।

ফিরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত আযাব সমূহ এবং মূসা (আ.)-এর মু'জেযা সমূহ ঃ (১) লাঠি (২) প্রদীপ্ত হস্ততালু (৩) দুর্ভিক্ষ (৪) তূফান (৫) পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত (৯) পেগ্ন (১০) সাগরডুবি। প্রথম দু'টি এবং মূসার ব্যক্তিগত তোতলামি দূর হওয়াটা।

তওরাত লাভ ঃ আল্লাহ মূসাকে অহীর মাধ্যমে ওয়াদা করলেন যে, তাকে সত্বর 'কিতাব' (তওরাত) প্রদান করা হবে এবং এজন্য তিনি বনু ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে তাকে 'তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসতে বললেন। অতঃপর মূসা (আ.) আগে এসে আল্লাহ্র হুকুমে প্রথমে ত্রিশ দিন সিয়াম ও ই'তিকাফে মগ্ন থাকেন। এরপর আল্লাহ আরও দশদিন মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। এই দশদিন ছিল যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। যথাসময়ে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বললেন। অতঃপর তাঁকে তওরাত প্রদান করলেন, যা ছিল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও সরল পথ প্রদর্শনকারী।

মূসা ও ফিরাঊনের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. আল্লাহ যালেম শাসক ও ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সংশোধিত না হলে সরাসরি আসমানী বা যমীনী গযব প্রেরণ করেন অথবা অন্য কোন মানুষকে দিয়ে তাকে শাস্তি দেন ও যুলুম প্রতিরোধ করেন।
২. দুনিয়াদার সমাজনেতারা সর্বদা যালিম শাসকদের সহযোগী থাকে। পক্ষান্তরে মযলূম দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা দ্বীনদার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের মখাপেক্ষী থাকে।
৩. দুনিয়া লোভী আন্দোলন নিজেকে অপদস্থ ও সমাজকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে আখিরাত পিয়াসী আন্দোলন নিজেকে সম্মানিত ও সমাজকে উন্নত করে।
৪. দুনিয়াতে যালিম ও মযলূম উভয়েরই পরীক্ষা হয়ে থাকে। যালিম তার যুলুমের চরম সীমায় পৌঁছে গেলে তাকে ধ্বংস করা হয়।
৫. দ্বীনদার সংস্কারককে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং কথায় ও আচরণে সামান্যতম অহংকার প্রকাশ করা হতে বিরত থাকতে হয়।

ইউনুস (আলাইহিস সালাম)

ইউনুস (আ.)-এর জাতি ঃ ইউনুস (আ.) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে আল্লাহ্র হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে আযাব নাযিল হ'তে পারে।

আল্লাহর আযাব থেকে তওবা ঃ তারা ভাবল, নাবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের জাতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হ'তে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবালবৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশু গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহ্র দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্তঃকরণে তওবা করে এবং আসন্ন আযাব হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন।

ওদিকে ইউনুস (আ.) ভেবেছিলেন যে, তাঁর জাতি আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার জাতি তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসেবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

মাছের পেটে ইউনুস ঃ হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হলে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হলে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহ্র হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হজম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)। মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭)।

ইউনুস মুক্তি পেলেন ঃ ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকা সময় তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করেন এবং আল্লাহর সাহায্য চান। ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকার পরে আল্লাহ্র হুকুমে নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হন। মাছের পেটে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি রুগ্ন ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা তিনি খেয়েছিলেন, যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিল। অতঃপর সুস্থ হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজ জাতির নিকটে চলে যান। যাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশী ছিল। তারা তাঁর উপরে ঈমান আনলো। ফলে

পুনরায় শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) বিভ্রান্ত জাতির দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া কোন সমাজ সংস্কারকের উচিত নয়।
(২) আল্লাহ তার নেক বান্দার উপর শাস্তি আরোপ করবেন না, যেকোন সংকটে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।
(৩) আল্লাহ্‌র পরীক্ষা কিরূপ হবে, তা পরীক্ষা আগমনের এক সেকেণ্ড পূর্বেও জানা যাবে না।
(৪) কঠিনতম কষ্টের মুহূর্তে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।
(৫) খালেছ তওবা ও আকুল প্রার্থনার ফলে অনেক সময় আল্লাহ গযব উঠিয়ে নিয়ে থাকেন। যেমন ইউনুসের কওমের উপর থেকে আল্লাহ গযব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।
(৬) আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোন পরিবেশে ঈমানদারকে রক্ষা করে থাকেন।

(৭) পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও জলচর প্রাণী সবাই আল্লাহ্‌র হুকুমে ঈমানদার ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়। যেমন মাছ ও লতা জাতীয় গাছ ইউনুসের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।
(৮) বাহ্যদৃষ্টিতে কোন বস্তু খারাব মনে হলেও নেককার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ উত্তম ফায়ছালা করে থাকেন। যেমন লটারীতে নদীতে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিজের জন্য অতীব খারাব মনে হলেও আল্লাহ ইউনুসের জন্য উত্তম ফায়ছালা দান করেন ও তাকে মুক্ত করেন।
(৯) আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দু'আ কবুল হয় না। যেমন গভীর সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন।
(১০) আল্লাহ্‌র প্রতিটি কর্ম তার নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। যা বান্দা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে।

দাঊদ (আলাইহিস সালাম)

দাঊদ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

- আল্লাহ দাঊদ (আ.)-কে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছিলেন।
- আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় সলাত হল দাঊদ (আ.)-এর সলাত।
- সর্বাধিক পছন্দনীয় সিয়াম ছিল দাঊদ (আ.)-এর সিয়াম।
- তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন, অতঃপর এক তৃতীয়াংশ সলাতে কাটাতেন এবং শেষ ষষ্টাংশে নিদ্রা যেতেন।
- তিনি একদিন অন্তর একদিন সিয়াম রাখতেন।
- শত্রুর মোকাবিলায় তিনি কখনো পিছু হটতেন না।
- পাহাড় ও পক্ষীকুল তাঁর অনুগত ছিল।
- তাঁকে দেয়া হয়েছিল সুদৃঢ় সাম্রাজ্য, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য বাগ্মিতা।
- লোহাকে আল্লাহ তাঁর জন্য নরম করে দিয়েছিলেন।
- আল্লাহ তা'আলা দাঊদকে নবুওয়াত দান করেন এবং তাকে কিতাব 'যবূর' দান করেন।
- তাঁকে অপূর্ব সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল। যখন তিনি যবূর তিলাওয়াত করতেন, তখন কেবল মানুষ নয়, পাহাড় ও পক্ষীকুল পর্যন্ত তা একমনে শুনত।
- তিনি শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানের সংখ্যা ছিল ১৯ জন।

দাঊদ (আ.)-এর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী ঃ ছাগপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচার: একদা দু'জন লোক দাঊদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে দাঊদ (আ.) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে পুরা ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত'। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেয়া হউক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অপর্ণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত্র যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেয়া হবে'। দাঊদ (আ.) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন।

দাঊদ (আ.)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন আমানতদার, প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা।
২. দ্বীনদার শাসকের হাতেই দুনিয়া শান্তিময় ও নিরাপদ থাকে। দাঊদ-এর শাসনকাল তার বাস্তব প্রমাণ।
৩. দ্বীনদার শাসককে আল্লাহ বারবার পরীক্ষা করেন। যাতে তার দ্বীনদারী অক্ষুন্ন থাকে। দাঊদ (আ.) সে পরীক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন।
৪. যে শাসক যত বেশী আল্লাহ্র শুকরগুযারী করেন, আল্লাহ তার প্রতি তত বেশী সদয় হন এবং ঐ রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল করেন। দাঊদ (আ.)ও সর্বাধিক ইবাদতগুযার ছিলেন।

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ দাঊদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলায়মান বাদশাহ হন। সুলায়মান ছিলেন পিতার ১৯জন পুত্রের অন্যতম। সুলায়মান (আ.)-এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন (মাযহারী, কুরতুবী)।

সুলায়মানের বৈশিষ্ট্য ঃ দাঊদ (আ.)-এর ন্যায় সুলায়ামন (আ.)-কেও আল্লাহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দান করেননি। যেমন ঃ (১) বায়ু প্রবাহ অনুগত হওয়া (২) তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা (৩) জিনকে অধীনস্ত করা (৪) পক্ষীকূলকে অনুগত করা (৫) পিপীলিকার ভাষা বুঝা (৬) অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা (৭) প্রাপ্ত অনুগ্রহ রাজির হিসাব না রাখার অনুমতি পাওয়া।

সুলায়মানের জীবনে উলেখ্যুযোগ্য ঘটনাবলী ঃ

পিপীলিকার ঘটনা : সুলায়মান (আ.) একদা তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলায়মান বাহিনীকে আসতে দেখে পিপীলিকাদের সর্দার তাদেরকে বলল, তোমরা শীঘ্র পালাও। নইলে পাদপিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুলায়মান (আ.) পিপীলিকাদের এই বক্তব্য শুনতে পেলেন।

'হুদহুদ' পাখির ঘটনা : সুলায়মান (আ.) আল্লাহ্র হুকুমে পক্ষীকুলের আনুগত্য লাভ করেন। একদিন তিনি পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত করেন ও তাদের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, 'হুদহুদ' পাখিটা নেই। তিনি অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করলেন। সাথে তার অনপুস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করলেন। 'কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে হাযির হয়ে বলল, (হে বাদশাহ!) আপনি যে বিষয়ে অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার নিকটে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি' (সূরা নামল ঃ ২০-২২)।

রাণী বিলক্বীসের ঘটনা : সুলায়মান (আ.)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা 'সাবা' রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলক্বীস। আল্লাহ তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নাবীগণের মাধ্যমে এসব নি'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্র অবাধ্য হয় এবং 'সূর্য পূজারী' হয়ে যায়। ফলে তাদের উপরে প্লাবণের আযাব প্রেরিত হয় ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়।

হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের কাহিনী : সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বকালে বেঈমান জিনেরা লোকদের ধোঁকা দিত এই বলে যে, সুলায়মান জাদুর জোরে সবকিছু করেন।

তিনি কোন নাবী নন। সুলায়মান (আ.) যে সত্য নাবী, তিনি যে জাদুকর নন, জনগণকে সেটা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং নাবীগণের মুজেযা ও শয়তানদের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূত নামে দু'জন ফিরিশতাকে 'বাবেল' শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন। ফিরিশতাদ্বয় সেখানে এসে জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকেন এবং জাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন সবাই সুলায়মানের নবুওয়াতের অনুসারী হয়, সেকথা বলতে লাগলেন।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : পিতা দাঊদ (আ.) বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আ.)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় সুলায়মানের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। এই কাজগুলি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হল। আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলো না, খসলো না বা পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি খেয়ে ফেলাতে তা ভেঙ্গে পরে যায় এবং সুলায়মান (আ.)-এর লাশও মাটিতে পড়ে যায়।

সুলায়মান (আ.)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. নবুঅত ও খেলাফত একত্রে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।
২. ধর্মই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
৩. প্রকৃত মহান তিনিই, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অহংকারী হন না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন।
৪. শত্রুমুক্ত কোন মানুষ দুনিয়াতে নেই। সুলায়মানের মত একচ্ছত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ্র বিরুদ্ধেও চড়ান্ত, ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার চালানো হয়েছে।

ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম)

জন্মস্থান ঃ ইলিয়াস (আ.) ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল'আদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নাবী হিসেবে মনোনীত করেন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দান করেন।

ইলিয়াসের দাওয়াত ঃ শিরকে আচ্ছন্ন ফিলিস্তীনবাসীকে ইলিয়াস (আ.) তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। কেননা শিরক ও তাওহীদের একত্র সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি ঃ বিগত নাবীগণের যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইলিয়াস (আ.)-এর ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ইস্রাঈলের শাসক আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'ল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং এক আল্লাহ্‌র প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানালেন। কিন্তু দুই একজন হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর কথা শুনল না। তারা ইলিয়াস (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হল। তাকে যত্রতত্র অপমান-অপদস্থ করা শুরু করল। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ইলিয়াস (আ.) তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে রাজা ও রাণী তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন এবং দুর্ভিক্ষ নাযিলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইলিয়াস (আ.) মনে করলেন দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তিনি যদি তাদেরকে মো'জেযা প্রদর্শন করেন, তা হলে হয়ত তারা শিরক বর্জন করে তাওহীদ কবুল করবে এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে ফিরে আসবে।

বাদশাহ্‌র দরবারে ইলিয়াসের উপস্থিতি ঃ আল্লাহ্‌র হুকুমে ইলিয়াস (আ.) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে সরাসরি ইস্রাঈলের বাদশাহ আখিয়াবের দরবারে হাযির হলেন। তিনি বললেন, দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের কারণ হল আল্লাহ্‌র নাফরমানী। তোমরা নাফরমানী থেকে বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। তোমরা বলে থাক যে, তোমাদের বা'ল দেবতার নাকি সাড়ে চারশ' নাবী (!) আছে। তাই যদি হয়, তা হলে তুমি তাদের সবাইকে একত্রিত কর। তারা এই দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বা'ল দেবতার নামে কুরবানী করুক। আর আমি একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী পেশ করি। যার কুরবানী আসমান থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে গণ্য হবে। ইলিয়াস (আ.)-এর এ প্রস্তাব সবাই সানন্দে মেনে নিল।

আল্লাহ ও বা'ল দেবতার নামে কুরবানীর ঘটনা ঃ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'কোহে কারমাল' নামক পাহাড়ী উপত্যকায় সকলে সমবেত হল। বা'ল দেবতার নামে তার মিথ্যা নাবীরা কুরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'ল দেবতার উদ্দেশ্যে আকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করা হল। কিন্তু দেবতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আসমান থেকে কোন আগুন নাযিল হল না। অতঃপর ইলিয়াস (আ.) আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করলেন এবং যথাসময়ে আসমান থেকে আগুন এসে তা খেয়ে গেল। বস্তুতঃ এটাই ছিল কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন। আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী কবুলের এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অনেকে সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল এবং ইলিয়াসের দ্বীন কবুল করে নিল। সকলের নিকটে ইলিয়াস (আ.)-এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বা'ল পূজারী কথিত ধর্মনেতারা ও তাদের স্বার্থান্ধ অনুসারীরা ঈমান আনল না।

বা'ল দেবতার পরিচয় ঃ সূরা ছাফফাত ১২৫ আয়াতে যে বা'ল দেবতার কথা বলা হয়েছে, আরবী ভাষায় এর অর্থ স্বামী বা মালিক। এটি ইস্রাঈলীদের পূজিত দেবমূর্তির নাম। মূসা (আ.)-এর সময়ে শাম অঞ্চলে এর পূজা হত। মক্কার খুযা'আহ গোত্রের নেতা আমর বিন লুহাই সর্বপ্রথম সিরিয়া থেকে বহু মূল্যের বিনিময়ে এই মূর্তি নিয়ে এসে কা'বা গৃহে স্থাপন করেন এবং জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, সিরিয়রা এই মূর্তির অসীলায় পানি প্রার্থনা করে। আমরাও এর অসীলায় পানি প্রার্থনা করব। তাতে সিরিয়ার ন্যায় মক্কা অঞ্চলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং এলাকা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। এটাই ছিল কা'বা গৃহে স্থাপিত প্রথম দেবমূর্তি।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) আহলি কিতাব হওয়া সত্তেও এবং নিজেদের গোত্রে হাজার হাজার নাবীর আগমন সত্তেও বনু ইস্রাঈলগণ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়েছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে।

(২) শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন ইস্রাঈলের রাণী ইযবীলের মাধ্যমে বা'ল মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল। পরে সারা দেশে তা চালু হয়ে যায়।

(৩) সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিকে আপোষহীনভাবে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে তাওহীদ বিরোধী কাজের সংস্কারে নামতে হয়। যেভাবে ইলিয়াস (আ.) একাকী উক্ত কাজে নেমেছিলেন।

(৪) মৃত ব্যক্তি বা তার কবরের কোন প্রভাব জীবিত ব্যক্তিদের উপরে পড়ে না। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আশপাশে অনেক নাবীর কবর থাকা সত্তেও তাদের বুকের উপরে সংঘটিত বা'ল দেবমূর্তি পূজার ব্যাপারে তাদের কোন প্রভাব তাদের স্বগোত্রীয় বনু ইস্রাঈলদের উপরে পড়েনি।

(৫) সর্বদা সমাজের কিছু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

আল-ইয়াসা‘ (আলাইহিস সালাম)

পরিচয় ঃ পবিত্র কুরআনে এই নাবী সম্পর্কে সূরা আন‘আম ৮৬ ও সূরা সদ ৪৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অন্য নাবীগণের নামের সাথে। সূরা আন‘আম ৮৩ হ’তে ৮৬ আয়াত পর্যন্ত ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা‘ সহ ১৭ জন নাবীর নামের শেষদিকে বলা হয়েছে- ‘ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘, ইউনুস, লূত্ব তাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ (আন‘আম ৬/৮৬)।

আল- ইয়াসা‘ (আ.) নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের নাবী ছিলেন। তিনি ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকূব-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। ইলিয়াস (আ.) সুলায়মান (আ.) পরবর্তী পথভ্রষ্ট বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পরে আল-ইয়াসা‘ নাবী হন এবং তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর শরী‘আত অনুযায়ী ফিলিস্তীন অঞ্চলে জনগণকে পরিচালিত করেন ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

(১) নাবীদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় মর্যাদা শর্ত নয়। শর্ত হ’ল-তাক্বওয়া ও আনুগত্যশীলতা।
(২) শয়তান বিশেষ করে পরহেযগার মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার কাছে সে পরাজিত হয়।
(৩) ধৈর্যগুণ হ’ল সফলতার মাপকাঠি। তাক্বওয়া ও সবর একত্রিত হলে মু’মিন সর্বদা বিজয়ী থাকে।
(৪) শুধু নিজস্ব ইবাদতই যথেষ্ট নয়। বরং জনগণের খেদমতে সময় ব্যয় করাই হল প্রকৃত মু’মিনের কর্তব্য।

যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিমাস সালাম)

পরিচয় ঃ যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সুলায়মান পরবর্তী দুই নাবী পরস্পরে পিতা-পুত্র ছিলেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহইয়া ছিলেন পরবর্তী নাবী ঈসা (আ.)-এর আপন খালাতো ভাই এবং বয়সে ছয় মাসের বড়। তিনি (আ.)-এর ছয় মাস পূর্বেই দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।

ইয়াহ্ইয়ার জন্ম বৃত্তান্ত ঃ যাকারিয়া (আ.) মারিয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন যে, আমার গর্ভের সন্তানকে আমি আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু পুত্রের স্থলে কন্যা সন্তান অর্থাৎ মারিয়াম জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ‘এই কন্যার মত কোন পুত্রই নেই’ (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩৬)।

এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? সম্ভবতঃ ঐসময় মারিয়ামের পিতা জীবিত ছিলেন না। বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির অভিভাবক হ’তে চায়। ফলে অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা হয়। সেখানে মারিয়ামের খালু এবং তৎকালীন নাবী যাকারিয়া (আ.)-এর নাম আসে। এ ঘটনাটিই আল্লাহ তাঁর শেষ নাবীকে শুনাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়- ‘(মারিয়ামের বিষয়টি) হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে প্রত্যাদেশ করছি। আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা লটারীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করছিল এ ব্যাপারে যে, কে মারিয়ামকে প্রতিপালন করবে? আর আপনি

তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল' (আলে ইমরান ঃ ৪৪)। 'অতঃপর আল্লাহ তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অপর্ণ করলেন' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)।

মারিয়াম মসজিদের সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া (আ.) তাকে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি মেহরাবে আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য-খাবার দেখতে পেতেন। তিনি একদিন এ বিষয়ে মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)।

সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়ার দু'আ ঃ সম্ভবতঃ শিশু মারিয়ামের উপরোক্ত কথা থেকেই নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়ার মনের কোণে আশার সঞ্চার হয় এবং চিন্তা করেন যে, যিনি ফলের মৌসুম ছাড়াই মারিয়ামকে তাজা ফল সরবরাহ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি বুকে সাহস বেঁধে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮)।

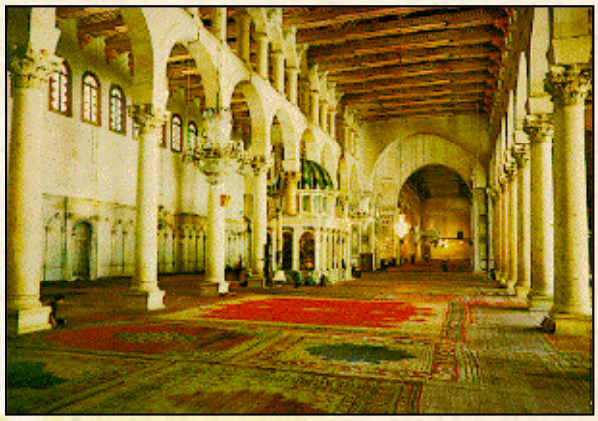

জবাবে আল্লাহ বললেন, 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি'। 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে পুত্র সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আর আমিও বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে উপনীত'। 'তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রভু বলে দিয়েছেন যে, এটা আমার জন্য খুবই সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না'। 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি (সুস্থ অবস্থায়) একটানা তিন দিন লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না'। 'অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল' (সূরা মারিয়াম ঃ ৭-১১)।

ইয়াহইয়ার বৈশিষ্ট্য ঃ ইয়াহইয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'হে ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ (তাওরাত) ধারণ কর। আর আমরা তাকে (৫) শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম' (মারিয়াম ১২)। 'এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে (৬) বিশেষভাবে দান করেছিলাম কোমলতা ও (৭) পবিত্রতা এবং সে ছিল (৮) অতীব তাক্বওয়াশীল'(১৩)। 'সে ছিল (৯) পিতা-মাতার অনুগত এবং (১০) সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না'(১৪)। 'তার উপরে শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে' (মারিয়াম ঃ ১২-১৫)। উপরে বর্ণিত আলে-ইমরান ৩৯ ও মারিয়াম ১২-১৫ আয়াতে ইয়াহইয়া (আ.)-কে প্রদত্ত মোট ১০টি বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়।

ইয়াহ্ইয়া ও যাকারিয়ার মৃত্যু ঃ যাকারিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না তাকে হত্যা করা হয়েছিল, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। মানছূরপুরী বাইবেলের বর্ণনার আলোকে বলেন, ইয়াহ্ইয়াকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু বাদশাহ্র প্রেমিকা ঐ নষ্টা মহিলা তার মাথা দাবী করায় জেলখানায় তাকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক ও রক্ত এনে ঐ মহিলাকে উপহার দেয়া হয়। অতএব উক্ত দুই নাবীর মৃত্যুর সঠিক ঘটনার বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ঈসা (আলাইহিস সালাম)

ঈসার মা ও নানী ঃ ঈসার নানী অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে।

ঈসার জন্ম ও লালন-পালন ঃ মহান আল্লাহ জিব্রীলকে প্রেরণ করলেন মারিয়ামের কাছে। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল'। 'মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও'। 'সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব'। 'মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই'। 'সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন। অতঃপর জিব্রীল মারিয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক দিলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হল (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯১; সূরা তাহরীম ঃ ১২)। অন্য আয়াতে একে 'আল্লাহ্র কলেমা' অর্থাৎ 'কুন্' (হও) বলা হয়েছে (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫)।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল' (মারিয়াম ২২)। 'এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম' (২৩)। 'এমন সময় ফিরিশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন' (২৪)। 'আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে পাকা খেজুর পতিত হবে' (২৫)। 'তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহ্র জন্য সিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না' (সূরা মারিয়াম ঃ ২২-২৬)।

ঈসা (আ.)-এর কাহিনী ঃ সাধারণতঃ সকল নাবীই ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আ.) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুওয়াত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে দাওয়াত দিবেন।

ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত ঃ ঈসা (আ.) নবুওয়াত লাভের পর নিজ জাতিকে নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন, 'হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি- (১) আল্লাহ্র রসূল হিসেবে (২) আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসেবে এবং (৩) আমার পরে আগমনকারী রসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসেবে, যার নাম হবে আহমাদ'... (সফ ঃ ৬)। তিনি বললেন, (৪)

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ’ (মারিয়াম ঃ ৩৬)। তিনি বললেন, ‘আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, (৫) আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর (৬) আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ। অতএব (৭) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’ (আলে ইমরান ঃ ৫০)।

ঈসা (আ.)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন ঃ তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। (১) আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্র হুকুমে। (২) আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং (৩) ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। (৪) আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্র হুকুমে। (৫) আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ (আলে ইমরান ঃ ৪৯)।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি ঃ ঈসা (আ.-এর মো‘জেযা সমূহ দেখে এবং তাঁর মখু নিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরীব শ্রেণীর কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেও দুনিয়াদার সমাজ নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের বাণী সমাজের স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

ঈসা (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহন ঃ তৎকালীন রোম সম্রাট ছাতিয়ূনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আ.)-কে গ্রেফতারের জন্য সরকারী বাহিনী ও ইহুদী চড়ান্তকারীরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরি মধ্যে আল্লাহ্র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আ.)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে। ইহুদী-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, ‘এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে।

ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

(১) তিনি ছিলেন পিতা ছাড়া জন্ম বিশ্বের একমাত্র নাবী (আলে ইমরান ঃ ৪৬ প্রভৃতি)।
(২) আল্লাহ স্বয়ং যার নাম রাখেন মসীহ ঈসা রূপে (আলে ইমরান ঃ ৪৫)।

(৩) তিনি শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ'তে মুক্ত ছিলেন (আলে ইমরান ঃ ৩৬-৩৭)।

(৪) দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি ছিলেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়জনদের অন্যতম (আলে ইমরান ঃ ৪৫)।

(৫) তিনি মাতৃক্রোড়ে থেকেই সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন (মারিয়াম ঃ ২৭-৩৩; আলে ইমরান ঃ ৪৬)।

(৬) তিনি বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন (আলে ইমরান ঃ ৪৯) এবং শেষনাবী 'আহমাদ'-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন (ছফ ঃ ৬)।

(৭) তাঁর মো'জেযা সমূহের মধ্যে ছিল- (ক) তিনি মাটির তৈরী পাখিতে ফুঁক দিলেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যেত (খ) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন (গ) তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন (ঘ) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ী থেকে যা খেয়ে আসে এবং যা সে ঘরে সঞ্চিত রেখে আসে (আলে ইমরান ঃ ৪৯; মায়িদাহ ঃ ১১০)।

(৮) তিনি আল্লাহ্র কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। তবে তওরাতে হারামকৃত অনেক বিষয়কে তিনি হালাল করেন (আলে ইমরান ঃ ৫০)।

(৯) তিনি ইহুদী চড়ান্তের শিকার হয়ে সরকারী নির্যাতনের সম্মখুীন হন। ফলে আল্লাহ তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন (আলে ইমরান ঃ ৫২, ৫৪-৫৫; নিসা ঃ ১৫৮)। শত্রুরা তাঁরই মত আরেকজনকে সন্দেহ বশে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে (নিসা ঃ ১৫৭)।

(১০) একমাত্র ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ক্বিয়ামতের আগে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠাবেন এবং দাজ্জাল, ক্রশ, শূকর প্রভৃতি ধ্বংস করাবেন। অতঃপর ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

ঈসা (আ.)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আ.)-এর বংশের হাজার হাজার নাবী-রসূলের মধ্যে সর্বশেষ নাবী ও কিতাবধারী রসূল ছিলেন ঈসা (আ.)।

(২) মু'জেযা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখানো যায় বা চুপ করানো যায়। কিন্তু হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্র রহমত আবশ্যক।

(৩) সবকিছু মানবীয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। বরং সর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসী ও আকাংখী থাকতে হয়। যেমন মারিয়াম ও ঈসার জীবনের প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, স্বাথর্পর ও দুনিয়া পূজারী সমাজ নেতারা তাদের শত্রু হয় এবং পদে পদে বাধা দেয়। কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও তারা পেয়ে থাকেন। যেমন ঈসা (আ.) পেয়েছিলেন।

(৫) দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হলেও চূড়ান্ত বিচারে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়।